

হেমেন্দ্রকুমার রায়ের ‘যকের ধন’: একটি উত্তরণবাদী অভিযাত্রা
সেখ সামিম আলি

Link : https://santiniketansahityapath.org.in/wp-content/uploads/2026/01/18_SK-Samim-Ali.pdf

সারসংক্ষেপ: হেমেন্দ্রকুমার রায়ের ‘যকের ধন’ উপন্যাসটি বিমল-কুমারদের অভিযাত্রাটি মানব-উত্তরণ লাভ করেছে। কাহিনির মূল কথা, বিমল-কুমাররা লোভী থেকে নির্লোভী হতে পেরেছে। প্রাথমিকভাবে বিমল-কুমাররা উপনিবেশবাদের পক্ষে অভিযান শুরু করেছিল। যদি বিমল-কুমারদের মধ্যে গুপ্তধনের লোভ না থাকতো তাহলে তারা কখনোই অভিযানে যেত না। লেখক সুচতুর কৌশলে বিমল-কুমারদের গুপ্তধনের প্রতি লোভকে মাথার মুকুট করে দৌড়িয়েও শেষ পর্যন্ত তাদের গুপ্তধনে স্পর্শ করতে দিলেন না। তাদের উত্তরণ নীতিকথার মাধ্যমে না ঘটে বাস্তব পরিবেশ পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে। যখন তারা দেখেছে জীবন বনাম গুপ্তধন। তখন তারা স্বাভাবিকভাবেই জীবনকে বেছে নিয়েছে। আমরা এই গবেষণায় বিমল-কুমারের এই চৈতন্যকে Theory of probability-র মাধ্যমে বিচার করার চেষ্টা করেছি।

আমাদের অনুসন্धानে স্পষ্ট হয়েছে যে, বিমল-কুমার নায়ক হলেও তাদের মনোবাসনার জয় হয়নি। বরং এই ‘যকের ধন’এর আসল মালিক যে রাজা, তার মনোবাসনা ছিল বিদেশীরা যেন এই ধন ভাঙার লুট করতে না পারে। লেখক রাজা চরিত্রটিকে স্বল্প পরিসরে রাখলেও তার মনোবাসনা পুরো উপন্যাস জুড়ে রয়ে গেছে। রাজা চরিত্রটি সম্পূর্ণভাবে উপনিবেশ বিরোধী একটি চরিত্র; আমরা এই চরিত্রটিকে কেন্দ্র করেই পুরো উপন্যাসটিকে উপনিবেশ বিরোধী উপন্যাসের দাবি রাখছি।

বিমল-কুমাররা এক অর্থে বিদেশি। এবং সেই অর্থে করালী মুখার্জিও বিদেশি। রাজার মনোবাসনার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে এই কাহিনির নায়ক ও খলনায়ক উভয় চরিত্রকেই খল নায়ক বলে মনে হবে। কারণ উভয়ই রাজার দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী অনৈতিক। এবং কাহিনির শেষে যেহেতু বিমল-কুমারদের মধ্যে আত্মসংযম দেখা যায়, গুপ্তধনের জন্য এক প্রকার যুদ্ধ করেও গুপ্তধন না পেয়ে তারা হতাশ না হয়ে স্বাভাবিক জীবনে যখন খুব সহজেই ফেরে তখন তার চেয়ে বড়ো মানব উত্তরণ আর কী বা হতে পারে!

সূচক শব্দ: উত্তরণবাদ, মানব-উত্তরণ, সম্ভাব্যতার জ্ঞান, গুপ্তধন, লোভ-নির্লোভ, যকের ধন।

হেমেন্দ্রকুমার রায়ের ‘যকের ধন’ উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ‘মৌচাক’ পত্রিকায় ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে। এই উপন্যাসটি রচনার কারণেই হেমেন্দ্রকুমারকে বাংলা অভিযান কাহিনির পথিকৃৎ বলা হয়। ‘যকের ধন’ হলো বাংলার প্রথম পূর্ণাঙ্গ অভিযান কাহিনি। ‘যকের ধন’ এর প্রধান নায়ক চরিত্র বিমল ও কুমার। যদিও অভিযান কাহিনির নায়ক চরিত্র বলতে একটি টিম বা গোষ্ঠীকে বোঝায় এবং যাদের উদ্দেশ্য সং। আমরা এই প্রবন্ধটিতে আলোচনা করতে চলেছি ‘যকের ধন’ উপন্যাসে বিমল ও কুমারের উত্তরণবাদী অভিযাত্রা প্রসঙ্গে। আমরা উত্তরণবাদ বলতে বোঝাচ্ছি, কোনো একটি চরিত্র যখন পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজের বিচার বুদ্ধি দ্বারা যে কোনো লোভের প্রতি সংযমী হয়ে নিজেকে খারাপ থেকে ভালো কিংবা ভালো থেকে আরো ভালোর দিকে নিয়ে যায় তাকেই আমরা ‘মানব-উত্তরণ’ বলতে পারি। ‘যকের ধন’এর কাহিনিতে বিমল-কুমার বাস্তব পরিস্থিতির মুখে পড়ে গুপ্তধনের লোভ থেকে মুক্তি পেয়েছে। যেহেতু বিমল-কুমাররা বিদেশি, আর রাজার মনোবাসনা ছিল বিদেশীদের হাতে গুপ্তধন যেন না চলে যায়, সেহেতু বিমল-কুমাররা যদি গুপ্তধন পেত, তবে তা ভারতীয় মানসিকতায় অনৈতিক হয়ে উঠত। বিমল-কুমার গুপ্তধনের রহস্য উদ্ঘাটন না করে এটা প্রমাণিত-

করেছে যে তাদের মূল উদ্দেশ্য হলো অভিযাত্রা। হেমেন্দ্রকুমার রায়ের ‘যকের ধন’ কাহিনির নায়ক বিমল ও কুমারের মধ্যে লেখক লোভ দিয়েছেন এবং বিমল-কুমার এই লোভ খুব সহজেই আত্মস্থ করেছে। আসলে তারা গুপ্তধনের লোভে পড়েই আসামের খাসিয়া পাহাড়ের দুর্গম এলাকায় অভিযান চালাতে আগ্রহ দেখিয়েছে। গুপ্তধনের প্রতি লোভের মাধ্যমে লেখক চরিত্র দুটিকে এক অর্থে উত্তরণের পথ দেখিয়েছেন, অন্যদিকে অভিযাত্রী হিসেবে গড়ে তুলতে পেরেছেন।

প্রাথমিকভাবে এই কাহিনিতে এটা প্রমাণিত যে, বিমল-কুমাররা অর্থলোভী। এখন প্রশ্ন হলো, লেখক কেন এই চরিত্র দুটিকে অর্থলোভী ক’রে সৃষ্টি করলেন? এর উত্তর হলো, হেমেন্দ্র অভিযান কাহিনিতে ইংরেজি অভিযান কাহিনির উপনিবেশবাদের প্রভাব আছে। ১৭১৯ সালে প্রকাশিত ড্যানিয়েল ডিফোর ‘রবিনসন ক্রুসো’ ইংরেজি সাহিত্যের প্রথম অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি।^১ এই কাহিনিটি উপনিবেশবাদের পক্ষে লেখা। যেহেতু ব্রিটিশ মানসিকতা ছিল অন্য দেশ দখল করে সেই দেশের ধনসম্পদ লুটপাট করে আনা এবং সেই দেশে শাসন চালানো। এরই সঙ্গে সেই দেশের রীতি-নীতি, আচার-আচরণ, ভাষা, পোশাক ইত্যাদিকে হীন মনে করে নিজেদের রীতি-নীতি, আচার-আচরণ, ভাষা, পোশাক ইত্যাদির প্রভাব ছলে-বলে-কৌশলে প্রয়োগ করা।

আমাদের অনুসন্ধানে এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, বিমল-কুমাররা এক অর্থে বিদেশি। তাদের প্রাথমিকভাবে উদ্দেশ্য ছিল অন্য দেশ তথা আসামের খাসিয়া পাহাড়ের ধন-সম্পদ লুটপাট করে নিয়ে স্বদেশে আসা এবং ‘নতুন দেশ দেখবার আনন্দ ক্রমেই আমাকে চাঙ্গা করে তুললে।’^৪ অনুমিত হয় এই ইচ্ছায় শেষ পর্যন্ত চরিত্র দুটি উপনিবেশবাদী হয়ে উঠতে পারে নি। আমরা অনুমান করেছি এর পেছনে দুটি কারণ থাকতে পারে; প্রথমটি হচ্ছে, বিমল-কুমাররা ভারতীয় মানসিকতা সম্পন্ন। ভারতীয় মানসিকতায় উপনিবেশিক লুটপাট সম্পূর্ণ নীতিবিরুদ্ধ। আর দ্বিতীয় কারণটি হলো, বাস্তব পরিবেশ পরিস্থিতি অর্থাৎ বাস্তব পরিস্থিতি তাদের এমন এক বিপর্যয়ের মুখে ফেলেছে যেখানে জীবন বনাম গুপ্তধন। এখানে বিমল-কুমাররা গুপ্তধনের চেয়ে জীবনকেই বেশি গুরুত্ব দিয়ে উপনিবেশ বিরোধী হয়ে ওঠার সম্ভাবনা সৃষ্টি করল। বিমল-কুমারদের এই অভিযাত্রাটিকে আমরা ‘লোভ থেকে নিরলোভের দিকে অভিযাত্রা’ বলতে পারি। এরপর আমরা আলোচনা করে দেখাতে চলেছি যে কীভাবে বিমল কুমাররা লোভী থেকে উঠলো! যে কোনো বৈষয়িক লোভ মানুষের একটি জন্মগত প্রক্রিয়া। অন্যদিকে ‘নিরলোভ সাধনা’ সর্বতোভাবে মানুষের বা চরিত্রের একটি অর্জিত প্রক্রিয়া। মানুষ বা চরিত্রটি তখন ‘নিরলোভ সাধনা’ অর্জন করতে পারে যখন চরিত্রটি বাস্তব পরিবেশ ও পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। তবে এজন্য চরিত্রটির মধ্যে আদর্শবাদ থাকা প্রয়োজন আছে। তাহলে এখানে একটা প্রশ্ন স্বাভাবিক যে, ‘যকের ধন’ এর বিমল-কুমারদের আদর্শবাদ কী? আসলে আদর্শবাদ বলতে আমরা বোঝাতে চাই, একটি চরিত্রের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত কোনো একটি বিশেষ নীতিকে। সে দিক থেকে বিমল-কুমারদের মধ্যে আমরা লক্ষ করেছি, প্রতিষ্ঠিত নীতি বলতে তাদের অভিযানকেই নির্দেশ করেছে। কারণ, তারা দুর্গম এলাকায় অভিযানের মাধ্যমে দিনে দিনে অভিযাত্রী হয়ে উঠতে চায়।

অভিযান করায় যাদের জীবনের সবকিছু তাদের আদর্শবাদও অভিযানকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠবে আশা রাখা যায়। তার আগে আমাদের জেনে নেওয়া প্রয়োজন যে অভিযান বলতে বিমল-কুমার কী বোঝে? বিমল-কুমারদের কাছে অভিযান হলো, তাদের আটপৌরে ধারাবাহিক জীবন থেকে বেরিয়ে যাওয়া। তারা মনে করে যে, প্রত্যেকটি মানুষ বিপদের মুখেই রয়েছে, দুর্গমের মধ্যে পড়ে আছে, দুর্গমকে জয় করায় বিমল-কুমারদের প্রধান লক্ষ্য; এবং সেই দুর্গম এলাকার অজানা তথ্য পাওয়াও তাদের অভিযানের বৈশিষ্ট্য। যদিও প্রাথমিকভাবে বিমল-কুমার অভিযান বলতে লুটপাটের মতো হানা দেওয়াকে বুঝেছিল। কিন্তু বাস্তব পরিবেশ পরিস্থিতি তাদের এই মানসিকতাকে পরিবর্তন করে দেয়। তবে তাদের মনকে দুমড়ে-মুচড়ে দিতে পারেনি। তার কারণ, তাদের জীবনে গুপ্তধনের প্রতি নিরাসক্ত লোভ দেখা যায়।

গল্পের সূচনা হচ্ছে একটি রহস্যকে কেন্দ্র করে। ঠাকুরদার রেখে যাওয়া মড়ার খুলি ও পকেট বুক লুকিয়ে রাখা ছিল রহস্যের বীজ।^৬ কুমারের বাড়ি থেকে করালীর বাস্তু চুরির মাধ্যমে রহস্যটাকে আরো একটু ঘনায়মান অশ্কার করে তোলা হলো।^৭ কুমার প্রাথমিকভাবে এই রহস্যের সদুত্তর খুঁজতে ঠাকুরদার পকেট বুক পড়ে কিছু তথ্য উদ্ধার করে ফেলল।^৮ কুমার ততটা বুদ্ধিসম্পন্ন না হওয়ার কারণে ধাঁধার রহস্য উদ্ধার করতে না পেরে সে তার আপন বন্ধু বিমলের স্মরণাপন্ন হলো।^৯ আমাদের অনুসন্ধানে এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, লেখক কৌশলবশত কুমারকে কম বুদ্ধিমান করে সৃষ্টি করলেন; কারণ, লেখক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে একটি অভিযান গোষ্ঠী তৈরি করতে চেয়েছিলেন। বিমল, কুমার, রামহরি ও বাঘা হলো সেই অভিযান গোষ্ঠীর সদস্য।^{১০} বাঘের হাত থেকে প্রাণ বাঁচানোর জন্য সন্ন্যাসী চরিত্রটি তুষ্টি হয়ে কুমারের ঠাকুরদাকে জানিয়ে দিয়েছিলেন ‘যকের ধন’ আসলে কোথায় আছে! এবং কীভাবে পাওয়া যাবে তার সমস্ত তথ্য। কুমারের ঠাকুরদা অভিযাত্রী ছিলেন না এবং অভিযান করার আকাঙ্ক্ষাও দেখান নি। এবং তিনি বুড়ো বয়সের দোহাই দিয়ে এই ভয়ংকর অভিযান থেকে মুক্তি নিয়েছেন। কিন্তু ঠাকুরদা চরিত্রটিকে অভিযান বিরোধী বলা যাবে না; কারণ, তিনি চেয়েছিলেন তার ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এই অভিযানে অংশগ্রহণ করুক।^{১১} ‘যকের ধন’ কাহিনিতে বিমল-কুমারদেব অভিযাত্রী হয়ে ওঠার পেছনে কুমারের ঠাকুরদার অবদান স্বীকার করতেই হয়। এক অর্থে নিলোভী সন্ন্যাসী কিন্তু আসল গুপ্তধনের সঠিক স্থান দিতে পেরেছিল। অতএব, এই চরিত্রটি এক অর্থে লোভের বার্তাবাহক হিসাবে কাজ করেছে। নিজের জন্য গুপ্তধনের প্রতি লোভ না থাকলেও অন্যকে লোভে উৎসাহিত করেছে। এই অর্থে সন্ন্যাসীকে পুরোপুরি নিলোভী বলা ঠিক হবে না।

এখানে বিমল-কুমারদের লোভী হওয়ার পেছনে দুটি কারণ অনুমান করা যাচ্ছে। প্রথমটি হলো, সন্ন্যাসী কর্তৃক গুপ্তধনের স্থান দেওয়া এবং দ্বিতীয় কারণটি হলো, রহস্য উদঘাটনের চেষ্টা। আদর্শে ওদের রহস্য উদঘাটনের চেষ্টা যতই বাড়ছিল ওদের লোভের বাসনাও তত বৃদ্ধি পাচ্ছিল। অন্যদিকে বিমল-কুমারদের অভিযান গোষ্ঠী গড়ে ওঠার পেছনে কুমারের ভয় ও করালীর বাস্তু চুরির ঘটনা প্রবলভাবে প্রভাব ফেলেছে। যেহেতু ‘যকের ধন’ একটি ইম্পিডেন্টাল অ্যাডভেঞ্চার কাহিনির উদাহরণ, সেহেতু বিমল-কুমারদের গোষ্ঠীর মাধ্যমে প্লানমাফিক অভিযান করা প্রধান অভীষ্ট। গুপ্তধনের লোভ হলো ‘যকের ধন’ কাহিনির মূল প্লট। এই লোভের মাধ্যমে কার্যকারণ সম্পর্ক প্রবল ভাবে জড়িয়ে আছে। লোভকে আত্মসাৎ করবার জন্যই তারা দুর্গম অভিযান করতে পেরেছে। আমরা যারা পড়াশোনা করছি তাদেরও তো লোভ রয়েছে। সরকারি কিংবা বেসরকারি চাকরি পাওয়া একজন শিক্ষিত ছাত্রের প্রধান লক্ষ্য। অর্থাৎ এখানে আমাদের লোভ অর্থনৈতিক স্বাবলম্বীতে। পৃথিবীর যে কোনো মানুষই যে কোনো শিক্ষা গ্রহণ করে নিজের জীবন চালানোর জন্য। তাহলে আমরা বিমল-কুমারদের গুপ্তধন লুটপাট করে আনার বিষয়টিকে কোন যুক্তিতে খারাপ বলতে পারি? এই প্রশ্নের উত্তরের আগে আমাদের জেনে নেওয়া প্রয়োজন যে যকের ধনের গুপ্ত সম্পত্তির আসল মালিক কে? সন্ন্যাসীর কথা অনুযায়ী — “সেকালের এক রাজা বিদেশি শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধযাত্রা করবার আগে এই মাঠে সমস্ত ধনরত্ন গচ্ছিত রেখে যান। কিন্তু যুদ্ধে তাঁর হার হয়। পাছে নিজের ধনরত্ন শত্রুর হাতে পড়ে, সেই ভয়ে রাজা সে সমস্ত ধন এক জায়গায় লুকিয়ে এক যককে পাহারায় রেখে পালিয়ে যায়।”^{১২} অর্থাৎ এটা তো স্পষ্ট যে, এই ধন আসামের দেশীয় রাজার। আমাদের এটা বুঝতে হবে যে, তিনি বিদেশি শত্রুর হাত থেকে এই ধনসম্পদ রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। সেই অর্থে বিমল-কুমাররাও বিদেশী। প্রকৃত অর্থে এই ধনের মালিক সেই বৌদ্ধমঠের সন্ন্যাসীরা। যেহেতু তাদের অস্তিত্ব নেই, তাই হিসাবমতো স্বদেশীয় শাসক কিংবা ওই সমাজের মালিকানায় থাকবে এই যকের ধন। আসলে সন্ন্যাসী চরিত্রটি দিয়ে কুমারের ঠাকুরদাকে যকের মড়ার মাথার খুলি দানের মাধ্যমে এমন এক অলৌকিক পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছে যার জন্য পাঠক মনে করতে পারে এই সম্পত্তির মালিকস্বত্ব হয়তো কুমারের ঠাকুরদাকে দিয়ে দেওয়া হলো। কিন্তু বাস্তবিক এটা সত্য নয়। কারণ আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন এই গুপ্তধনের আসল মালিক ছিলেন সেই স্বদেশীয় রাজা। যিনি বিদেশি শত্রুর হাত থেকে নিজের দেশের সম্পত্তিকে নিজের মৃত্যুর বিনিময়েও রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। দেখা যায় গল্পের শেষে-

হেমেন্দ্রকুমার রায় এটাই প্রমাণ করেছেন যে, ‘যকের ধন’ বিমল-কুমার বা করালীর কারো নয়। আসলে এই কাহিনিতে সেই বিদেশি রাজার হাতে হেরে মরে যাওয়া এক স্বদেশীয় রাজার মনোবাসনার জয়কে প্রকটভাবে দেখানো হয়েছে। সেই রাজা হয়তো বা নিশ্চিত ছিলেন যে বিদেশি রাজার সঙ্গে যুদ্ধে তার হার হবে। তিনি এটা খুব ভালোভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে, মানুষ অর্থের জন্যেই যুদ্ধ করে। তাই তিনি কখনোই চাননি তার গচ্ছিত ধন-সম্পদ বিদেশিরা নিয়ে চলে যাক। তাই তিনি সেগুলো লুকিয়ে রেখে যান মঠের কোনো এক জায়গায়। তবে এক যককে পাহারায় রেখে যাওয়া বিষয়টি অলৌকিক। এটা হতে পারে সন্ন্যাসী চরিত্রটির দ্বারা বানানো একটি বিষয়। এটির সঙ্গে বাস্তবিক কোনো মিল নেই। আমরা লক্ষ্য করেছি, সন্ন্যাসী চরিত্রটি কুমারের ঠাকুরদাকে তুষ্ট করতে এরকম গল্প বলে যকের ধনের লোভ দেখিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি বাস্তবিক গুপ্তধনের অস্তিত্বের সঠিক খবর দিয়েছিলেন।

এই কাহিনির পরাজিত রাজা চরিত্রটি উপন্যাসে স্বল্প স্থান জুড়ে থাকলেও এই রাজার মনোবাসনা পুরো উপন্যাস জুড়ে রয়েছে। হেমেন্দ্রকুমার এই রাজা চরিত্রটির মাধ্যমে ইংরেজদের উপনিবেশবাদী মনোভাবের বিরোধিতা করেছেন। ব্রিটিশ সরকার জানতো যে তাদের শাসন ক্ষমতা একদিন না একদিন ঠিক নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তাই তারা ছলে-বলে-কৌশলে সাধারণ জনজীবনের ভাষা, রীতিনীতি, পোশাক, আচার-ব্যবহার ইত্যাদিকে হীন মনে করে নিজেদের সংস্কৃতির প্রভাব ফেলতে শুরু করে। যে কারণে আজ আমরা ভারতীয়রা ইংরেজি ভাষাকে অফিশিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে ব্যবহার করে থাকি; এবং পোশাক পরিচ্ছেদেও তাদের আমরা অনুকরণ করছি। অর্থাৎ আমরা ভারতীয়রা উত্তর-উপনিবেশবাদ থেকে মুক্তি লাভ করতে পারিনি। বিমল-কুমাররাও প্রাথমিকভাবে উপনিবেশবাদী হতে চেয়েছিল। কিন্তু তারা শেষ পর্যন্ত তা পারে নি। তারাও উত্তর উপনিবেশবাদী হিসাবে উপন্যাসের শেষেও থেকে যায়। তবে এই চরিত্র দুটোকে আমরা পুরোপুরিভাবে উপনিবেশ বিরোধী চরিত্র বলতে পারি না। তার প্রথম কারণ হলো, আসামের খাসিয়া পাহাড় ও তাদের বাসস্থান দুটি ভিন্ন রাজ্যকে নির্দেশ করেছে। এই অর্থে তারা বিদেশি। বিমল-কুমারদের প্রাথমিক পর্যায়ের যে মানসিকতা ছিল তার মধ্যেও অর্থ লোভ স্পষ্ট ভাবে বোঝা যায়। তবে তাদের মধ্যে অজানাকে জানার আগ্রহও ছিল প্রবল। এখানে প্রশ্ন হলো, তাহলে তো বিমল-কুমাররা এই অর্থে নাযকের চেয়ে বেশি খলনায়ক? প্রাথমিকভাবে যদিও বিমল-কুমারদের মধ্যে খল চরিত্রের কিছু কেমন বৈশিষ্ট্য লুকিয়ে ছিল, কিন্তু তাই বলে বিমল-কুমারদের খল চরিত্র বলা যাবে না। প্রাথমিকভাবে হেমেন্দ্রকুমার রায় বিমল-কুমারদের দিয়ে উপনিবেশবাদের পক্ষেই যুদ্ধ করিয়েছেন। কিন্তু তাদের মানসিকতায় উপনিবেশবাদের লক্ষণ থাকলেও, উপনিবেশবাদের কোনো শাসন নেই।

আমরা জানি যে ব্রিটিশরা ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে ধুরন্ধর অভিযাত্রী। ব্রিটিশরা অভিযানে সাফল্য লাভ করেছিল। পৃথিবী জুড়ে তারা তাদের ভাষা ও সংস্কৃতিকে পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে দিতে পেরেছিল। এই দৃষ্টিকোণ থেকে ব্রিটিশদের শুধুমাত্র লুটেরা বলা উচিত নয়। তারা সারা পৃথিবী জুড়ে যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দিয়েছিল তা অনেক মানুষেরই উপকারে এসেছিল। তবে নিজের সংস্কৃতি জোর করে কারো ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়াও অনৈতিক। ব্রিটিশ চিন্তা-ভাবনায় উপনিবেশিক মানসিকতা ভালো বা নৈতিক সমতুল্য, কিন্তু ভারতীয় মানসিকতায় উপনিবেশিক শাসন একপ্রকার অনৈতিক কাজ। যেহেতু বিমল-কুমাররা ভারতীয় তাই তারা ব্রিটিশ চিন্তা ভাবনার অনুকরণ করতে চাইলেও পুরোপুরি অনুকরণ করে সাহেব হতে পারেনি। একপ্রকার যুদ্ধের মতো পরিশ্রম করে যখন বিমল-কুমার রূপনাথের গুহায় যকের ধনের সম্মুখে উপনীত হলো তখনো তাদের মধ্যে অর্থ লোভ স্পষ্ট বোঝা যায়। কিন্তু যখন যকের ধনকে কেন্দ্র করে বিমলের সঙ্গে করালীর ধস্তাধস্তি শুরু হলো, এবং যখন করালী মুখার্জি সেই জলমগ্ন গহ্বরে পড়ে গেল এবং তার মৃত্যু হলো, আর গুপ্তধনও যেন জল-পাতালে চলে গেল তখন বিমলের চৈতন্য হলো বলা চলে। বিমল বলে উঠলো — ‘আঙুর যখন নাগালের বাইরে, তখন তাকে তেতো বলেই মনকে প্রবোধ দেওয়া যাক’।^{১২} অর্থাৎ বিমল ও কুমার বুঝতে পেরেছিল জীবনের গুরুত্ব।

এটা তো আমরা কম-বেশি সকলেই বুঝি যে, জীবনের জন্য ধনসম্পদ, কিন্তু ধন-সম্পদের জন্য তো জীবন নয়। আসলে তারা উপলব্ধি করেছিল যে তারা আসলে অভিযাত্রী, তারা লুঠেরা নয়। তারা এর রহস্য উদ্ঘাটন করতে এসেছিল কিন্তু তা পারেনি। গল্পের শেষেও গুপ্তধনের রহস্য রহস্যই থেকে গেল। কিন্তু তাদের এই অভিযান তাদের একটা শিক্ষা দিল। তাদের মধ্যে তৈরি হলো Sense of Probability বা সম্ভাব্যতার জ্ঞান। সম্ভাব্যতার জ্ঞান বলতে আমরা বোঝাচ্ছি, যখন কোনো একটি চরিত্র ঘটমান ভবিষ্যতে কী হতে থাকবে তা অনুমান করতে সক্ষম হয়ে সেই সম্ভাব্য পরিস্থিতির জ্ঞান থেকে নিজেকে বিপদ মুক্ত রাখতে পারে সেই অবস্থাকে। এখানে বিমল-কুমাররা মৃত্যুকে বরণ করে নেয় নি। এখানে তারা কোনো দুঃসাহস দেখানোর চেষ্টা করেনি। তার কারণ, তারা উপলব্ধি করেছে এই জলমগ্ন গহ্বরে গুপ্তধন তাদের নাগালের বাইরে চলে গেছে। সেটা লাভ করার কোনো সম্ভাবনা তারা দেখতে পায়নি। যে কারণে তারা স্বদেশে ফেরার ইচ্ছা প্রকাশ করে বলে — “আহারের পর নিদ্রা, তারপর দুর্গা বলে স্বদেশের দিকে যাত্রা, কী বলো?”^{১৩}

আমাদের অনুসন্ধান এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, এই জলমগ্নে করালীর মৃত্যু যেন উপনিবেশবাদের মৃত্যুকে ধ্বনিত করেছে। অপরদিকে বিমল কুমারদের গুপ্তধন না পাওয়া এবং গুপ্তধনের প্রতি আকাঙ্ক্ষা ত্যাগের যে একটা বাতাবরণ তৈরি করা হয়েছে তার মাধ্যমে বোঝা যাচ্ছে বিমল-কুমাররা মানব উত্তরণে পৌঁছেছে। তারা যেহেতু ভারতীয় তাই তাদের লুটপাট অনৈতিক বলে মনে হবে। তারা যদি প্রকৃত অর্থে লোভী হতো তাহলে তারা নিশ্চয়ই ভীষণভাবে আশাহত হতো। কিন্তু তারা এক মুহূর্তের জন্যও আশাহত হয়নি। বিমলের কথা অনুযায়ী — “যকের ধন কি মানুষের ভোগে লাগে? করালি ভূত হয়ে চিরকাল তা ভোগ করুক — দরকার নেই আর তার জন্য মাথা ঘামিয়ে! আপাতত বড়োই ক্ষুধার উদ্বেক হয়েছে কুমার! তুমি একবার চেষ্টা করে দেখো পাখি-টাকি কিছু মারতে পারো কিনা! ততক্ষণে রাম হরি ভাত চড়িয়ে দিক, আর আমি ওষুধ মালিশ করে গায়ের ব্যথা দূর করি!”^{১৪} এত বড়ো লড়াইয়ের পর গুপ্তধন না পেয়েও তারা কত সহজে তাদের ধারাবাহিক জীবনে ফিরতে পারল। এর চেয়ে বড়ো মানব উত্তরণ আর কী-ই বা হতে পারে? এই উপন্যাস যেন শেখাচ্ছে দুর্গমের মধ্যে ঝাঁপ দিলে নূতন কিছু শেখা যায়, নূতন ভাবে বাঁচা যায়। গুপ্তধন না পেয়েও তাদের মধ্যে এতটুকু বিষণ্ণতা দেখা গেল না। এর কারণ হিসাবে আমরা অনুমান করেছি, বিমল-কুমারদের নিরাসক্ত-মন। তারা কোনো কিছুতেই পুরোপুরি আসক্ত নয়।

আমরা পরিশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, বিমল-কুমারদের অভিযাত্রা এক প্রকার উত্তরণবাদী অভিযাত্রা। বিমল-কুমারদের মধ্যে উপনিবেশবাদের প্রভাব থাকলেও তারা উপনিবেশবাদী নয়। বলা চলে, তাদের মধ্যে উপনিবেশবাদের লক্ষণ আছে, কিন্তু উপনিবেশবাদের কোনো শাসন নেই। মূল আলোচনায় এটাও প্রমাণিত যে বিমল-কুমাররা কোনো নীতিকথার মাধ্যমে মানব-উত্তরণে পৌঁছায় নি। আসলে তারা বাস্তব পরিবেশ পরিস্থিতির মুখে পড়ে মানব-উত্তরণ লাভ করেছে। আবার এটাও প্রমাণিত হয়েছে যে তারা গুপ্তধন না পেয়েও হতাশাবাদী নয়। তারা খুব সহজেই স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পেরেছে। তারা কাহিনির শেষেও গুপ্তধনের রহস্য উদ্ঘাটন করতে সমর্থ হয়নি। আসলে অভিযাত্রীদের প্রধান কাজই হলো যে কোনো দুর্গম এলাকায় অভিযান চালানো, কোনো রহস্য উদ্ঘাটন হোক বা না হোক। তাদের অভিযানের লাভ হলো, বাস্তবের মুখে এসে চেতনার পরিবর্তন ও উত্তরণ। যে কোনো কিশোরদের কাছে এই উত্তরণ হতাশার অন্ধকারে আলোর দিশা দেখাবে।

তথ্যসূত্র:

১. ‘শিশু সাহিত্যের ক্রমবিকাশ (১৮০০-১৯০০)’, আশা গঙ্গোপাধ্যায়, ডিএম লাইব্রেরী, ৪২ কর্নওয়ালিস স্ট্রিট, কলকাতা ৬, প্রথম প্রকাশ ১৩৬৬, পৃ. ২৮১
২. ‘হেমেন্দ্রকুমার রায়: বিমলকুমার সমগ্র অখণ্ড’, সম্পাদনা সমুদ্র বসু ও অমিতাভ ও চক্রবর্তী, ২০১৯ এ বিধান সরণি, কলকাতা ৬, প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ২০২৩, পৃ. ৮৩৯

৩. ROBINSON CRUSOE, DANIEL DEFOE, PENGUIN GROUP, 80 STRAND, LONDON WC2R ORL, ENGLAND, REPRINTED 2003, INTRODUCTION -IX
৪. 'হেমেন্দ্রকুমার রায়: বিমলকুমার সমগ্র অখণ্ড', সম্পাদনা সমুদ্র বসু ও অমিতাভ ও চক্রবর্তী, দীপ প্রকাশন, ২০৯ এ বিধান সরণি, কলকাতা ৬, প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ২০২৩, পৃ. ৮
৫. ওই, পৃ. ২
৬. ওই, পৃ. ১-২
৭. ওই, পৃ. ২-৪
৮. ওই, পৃ. ৫
৯. ওই, পৃ. ১৪
১০. ওই, পৃ. ৪
১১. ওই,
১২. ওই, পৃ. ৫৩
১৩. ওই,
১৪. ওই,

লেখক পরিচিতি: সেখ সামিম আলি, গবেষক, বাংলা বিভাগ, ভাষাভবন, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, পশ্চিমবঙ্গ।